'বলাকা'-র (১৯১৬) একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য গতিবাদ। রবীন্দ্রনাথের 'গীতালি' প্রকাশের পূর্বেই ফরাসী দার্শনিক বার্গসঁ-র বিখ্যাত গ্রন্থ Creative Evolution প্রকাশিত হয়। তবে বলাকার গতিবাদ অনেকটাই বার্গসঁ-র গতিবাদের মত হলেও সম্পূর্ণ এক নয়। বার্গসঁ-র গতিবাদ সম্পূর্ণ নিরর্থক, তাতে কোন সার্থকতা বা কোন পরিণাম নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বলাকা 'উদ্দাম চিত্ত' থেকে চলা বা 'অন্তহীন অকারণ চলার' কথা বললেও কোথাও একটা পরিণামের ইঙ্গিত আছে।

ইতিপূর্বে ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি' (The Song offerings) লেখার জন্য কবি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন, দীর্ঘ প্রবাসজীবন (১৯১২-১৩ সালে সাতের মাস ইংলন্ড ও আমেরিকা সফর) রবীন্দ্রনাথের অন্তর্জগতে নতুন পরিবর্তন প্রকাশ করেছে। এই নতুন কাব্যে কবি যেন সম্পূর্ণ নবজাগরণের সাক্ষাৎ পেলেন। অন্যদিকে বিশ্বের রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৯১৪-তে শুরু হয় বিশ্বযুদ্ধ, সারা পৃথিবীতে প্রচণ্ড ভাঙচুরের আয়োজন চলেছে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ত্রাসে উঠেছে বিশ্ববাসী। সেই যুদ্ধের প্রভাব পড়েছে 'বলাকা'র কবিতাবলীতে। এই সময় ১৯১৪ সালে প্রমথ-চৌধুরীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সবুজপত্র। যে পত্রিকা বাংলার সাহিত্যপাঠকদের এবং সাহিত্যিকদের চিন্তা-চেতনাকে ঝাঁকিয়ে দেবার, ও নাড়িয়ে দেবার দায়িত্ব নিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এই পত্রিকার অন্যতম অন্যতম লেখক হিসেবে সময়োপযোগী চিন্তা ভাবনাকে সফল রূপে উদ্ভূত কবিতাবলি এই পত্রিকাতেই বেশীরভাগ প্রকাশ করেছেন।

'বলাকা'য় কবি মানবমুক্তির যে গতিপথের সন্ধান দিয়েছেন, সংক্ষেপে তাকে 'নূতনের আবাহন' কিংবা বলা যেতে পারে 'অবিচলিত বিরামের লক্ষ্যে নূতনের পথে অবিরাম যাত্রা', জীর্ণ-সংস্কারাচ্ছন্ন-অচল-বদ্ধ-অবসন্ন পাকা পুরাতনকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নতুনকে বরণ করলে তবেই মুক্তি সম্ভব।

এই পথে অবসাদ, আছে, আঘাত আছে, রক্তপাত আছে, মৃত্যু আছে; কিন্তু অবশেষে শুভ অমঙ্গল শেষে ফিরে আসবে শান্তি, মঙ্গল, সৌন্দর্য। এমনি করেই সকল বৈশ্বিক সংকট ও সভ্যতার বিপর্যয় শেষে পৃথিবীতে মানবমুক্তি ঘটবে।

'পাড়ি' - রচনাকাল: ৫ ভাদ্র, ১৩২১, স্থান - কলকাতা, সবুজপত্র প্রকাশিত।

'বলাকা'র ৫ সংখ্যক কবিতা - 'পাড়ি'। কবিতাটি বিশ্বযুদ্ধ ~~রচনার~~ শুরুর প্রথম সপ্তাহেই রচিত। তখনো যুদ্ধ শুরু হয়নি। এই বিশ্বযুদ্ধের সিংহদ্বার দিয়ে যে মানিক রতন আসবে, তার কাছে আসবে - কবি সেই নতুন চেতনায় ভাবিত হয়েছেন। এই কবিতার শুরুতে সেই বিশ্বযুদ্ধের আভাস ইঙ্গিত রয়েছে। কবি নিজেই বলেছেন, 'বলাকা'র কবিতাগুলো বলাকার মত ইতস্ততঃশ্রেণীর মতনই একেকটি পক্ষ ঝাপটে মানসলোক থেকে নিরুদ্দেশের পানে যাত্রা শুরু করেছিল। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে কবির কাছে যুদ্ধটি শুভের সংহারী প্রলয়ঙ্করী রুদ্রের রূপ নিয়ে দেখা দিল।

ঝড় বয়েছে, ঝড়ের হাওয়া লাগিয়ে দিয়ে পালে
আসছে তরী বেয়ে।
কালো রাতের কালি-ঢালা ভয়ের বিষম বিষে
আকাশ যেন মূর্ছি পড়ে সাগর সাথে মিশে,
উতল ঢেউয়ের দল খেপেছে, না পায় তারা দিশে;
উধাও চলে ধেয়ে।

তারপর কবির আকাঙ্ক্ষিত সেই ফুলছড়া নেয়ে তরীতে সাদা পাল উড়িয়ে সকলকে চমকে দিয়ে হবে বিজয়ী। তার অভিসারে আসে। এই নেয়েই তরীই বিজয়ীর তরী, তার পাল শান্তির সাদা পাল। সেই নেয়েই আলোর বন্যার গৌরব বাড়িয়ে কবিকে আপন সাথী করবে।

'পাড়ি' কবিতায় কবি প্রশ্ন করেছেন - নাবিক যে সম্পদ নিয়ে আসছেন তা কি? এবং নাবিক কোন ঘাটে উত্তীর্ণ হবেন?

Scanned with CamScanner

সেই নাবিককে যদি আরও প্রশ্ন করেন - যুদ্ধের সাগর পার হয়ে এসে তিনি কেন দেশ-বন্ধুর হাতে তাঁর সম্পদকে দান করবেন? কার হাতেই বা তিনি নবীন প্রাতে হাল ধরিয়ে দেবেন তা যদি জানেন না, তবে যদি উপলব্ধি করেছেন এ মানিক বা রতনের ভার-বোঝা নয়।

নহে নহে, নহেকো মানিক, নহে রতনের ভার,
একটি ফুলের গুচ্ছ আছে রজনীগন্ধার,
সেইটি হাতে আঁধার রাতে সাগর হবে পার
আনমনে গান গেয়ে।

তারপর সেই নাবিক এত যুদ্ধের সাগর পাড়ি দিয়ে এসে কাকে বিজয়মাল্য পরাবেন, তিনি কাকে তাঁর অমূল্য সম্পদ দান করবেন - ~~তিনি~~ তিনি অবশ্যই ক্ষমতালিপ্সু সাম্রাজ্যবাদী বীর নয়, সে কাকে -

সে আছে এক পথের পাশে, অদিনে যার তরে বাঁশির সুর নেয়ে।
তারি লাগি পাড়ি দিয়ে সবার অগোচরে
আসছে তরী বেয়ে।

সাধারণ মানুষের জন্য, অনাহারী, অত্যাচারিত নিপীড়িত-চাষী শ্রমজীবী মানুষের জন্য, কবির আকাঙ্ক্ষিত অভিপ্রেত বিজয়ের জন্যই নাবিক আসছে তরী বেয়ে। ঐ যুদ্ধ এখনো চলছে, সেই শান্তির ~~বিরাম আসন~~ আসতে - দেরা আসতে কঠিন, ~~তবু~~ আসতে দেরী। কিন্তু সে আসবে, রাত প্রভাত হলে। সে আগমন খুব কোলাহলে হবে না। সবার অলক্ষ্যে, নীরবে নিভৃতে জীর্ণ পথের পাশে, জীর্ণ ঘাটে, রজনীগন্ধার তোড়া হাতে নাবিক এসে ভিড়বে। কেটে যাবে অন্ধকার, আলোয় ভরে যাবে, বেদনা হবে দূর, পূর্ণ হবে দেশ। মানবমুক্তির পথ তৈরী হবে।

Scanned with CamSc

'বলাকা' ৩৬ সংখ্যক কবিতা
রচনাস্থান: শ্রীনগর, সময়কাল: কার্তিক ১৩২২

'বলাকা' (১৯১৬) কাব্যের ৩৬ সংখ্যক কবিতা 'বলাকা'-র নামেই কাব্যের নামকরণ হয়েছে। কবি নিজেই বলেছেন - " বলাকা বইটার নামকরণের মধ্যে এই কবিতার (৩৬) মর্মগত ভাবটি নিহিত আছে।" এই সময়ে কবি ছিলেন কাশ্মীরের শ্রীনগরে। শ্রীনগরে সন্ধ্যায় বজরার ছাদে বসেছিলেন কবি। সেই সময় সন্ধ্যার উপর দিয়ে এক ঝাঁক বলাকার উড়ে যাওয়া - কবিচিত্তে যে ভাবতরঙ্গ, যে গতির অনুভব তরঙ্গায়িত হয়েছিল কবিহৃদয়ে, - তারই প্রকাশ ঘটেছে 'বলাকা' - কবিতায়, যাযাবর পাখীর ঝাঁক অনন্ত আকাশপথে উড়ে যাবার সময় কবিকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল যে জগতের সব কিছুই যাযাবর, গতিশীল, জড় থেকে প্রাণী সবাই। এক অবিরাম যাত্রাপথের বিশ্ব এক সর্বব্যাপী গতির ছন্দে, যেন এক নিরুদ্দেশ যাত্রার নির্দেশে ছুটে চলেছে অনন্ত থেকে অনন্তের পানে। 'বলাকা' বলাকার পাখার ধ্বনি যেন সেই বার্তাই দিয়ে যায় প্রাচীন ঋষির মত,

'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে,'

প্রাচীন ঋষির মতই কবি উদাত্ত কণ্ঠে যেন বলে ওঠেন - " হে অনন্তের পথিক, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে সকলেরই যাত্রা করিয়া চলিতে হইবে," কোথাও স্থির হয়ে দাঁড়াবার, গতিবদ্ধ হয়ে জীবন বন্দী সময় নেই, ইহাই আমাদের

~~~~ 'বলাকা' কবিতার মধ্যে আছে অজানা উদ্দেশ্যের আহ্বান, আছে নতুন যুগে জাগরণের আনন্দ। যুদ্ধের ভেতর অন্ধকারময় অনুভূতি নয়, অতীত অন্ধকার পেরিয়ে, আনন্দের সম্ভাবনার →

Scanned with CamSc
~~~~

সম্ভাবনা কথাই আঁকতে চেয়েছেন কবি বলাকার ডানায় চলার আনন্দের মধ্য দিয়ে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ও কাব্যচর্চার প্রথমপাদে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' হৃদয়ে যে উচ্ছ্বাস, আনন্দ অনুভব করেছিলেন, নবসূর্যোদয়ে, তেমনি বলাকার ডানা মেলে উড়ে যাওয়ার মধ্যে যে চঞ্চলতা, যে বেগ, যে উদ্দামতা ও আনন্দ তিনি আবিষ্কার করলেন — তাই যেন প্রত্যক্ষ করলেন - মানবজীবনে, প্রাকৃতিজগতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে।

হে হংসবলাকা,
ঝঞ্ঝা-মদরসে মত্ত তোমাদের পাখা
রাশি রাশি আনন্দের অট্টহাসে
বিস্ময়ের জাগরণ তরঙ্গিয়া চলিল আকাশে।

বলাকা-

ভোগ আর উপভোগের বাইরে যে সুন্দর জীবন, দুর্নিবার যে অসীম রহস্য ও স্বপ্নঘেরা মমতা, তার সৌন্দর্য দেখে নেওয়ার আহ্বান আছে এই কবিতায়। এই গভীরতর তন্দ্রা থেকে আত্মার ভেদ জেগে ওঠবার আহবান আছে 'বলাকা' কবিতায়।

'মনে হল এ পাখার বাণী
দিল আনি
শুধু পলকের তরে
পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে
বেগের আবেগ।'

কবি উপলব্ধি করেছেন, এ বসুন্ধরার তাবৎ জড়বস্তুও গতির পাশে যোগ দেবার জন্য ব্যাকুল। গতিভাবনায় লীন কবি অবলোকন করেছেন — পাহাড়-পর্বত, বৃক্ষাদি, মেঘমালা — সকলেরই অসীম অন্বেষায় নিজেকে

Scanned with CamSc

মেলে ধরতে চায়। এভাবেই জানবার, শিখবার জানবার অসীম আকুলতা, অস্থিরতা সবখানেই যেন অনুভব করেছেন কবি।

কবির আকুল বাণী নিখিলের প্রাণে—
“হেথা নয়, হোথা নয়, আর কোনখানে।”

সন্ধ্যার আলো-আঁধারি রহস্যময়তার ভেতর অবগাহন করতে করতে কবি প্রবেশ করেছেন এক গভীর রহস্যের মায়াজালে, — চারদিকে যেন অজানার খেলা, অসীম শূন্যতার সৌন্দর্যকে ধরতে না পারার বেদনায় বিহ্বল এই পৃথিবীর আকাশ-বাতাস। যেন নিজেকে মেলে দেবার, সুদূরকে ছুঁতে চাবার সময় এসেছে। সন্ধ্যা শুধু অন্ধকারের শুভ সূচনা আমাদের দোরগোড়ায়, বিশ্বলোকের অজানা কিছুকে জানবার সীমাহীন উদ্যম আর চেতনার চঞ্চলতা, অজানা মহাসমুদ্রের অভিযাত্রী হিসেবে কবি আমাদের সামনে তুলে ধরলেন। সেই অজিত বাণীই বলাকা কবিতায় ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত।

বলাকা—

শুনিলাম মানবের কত বাণী দলে দলে
অলক্ষিত পথে উড়ে চলে
অস্পষ্ট অতীত হতে অস্ফুট সুদূর যুগান্তরে।
শুনিলাম আপন অন্তরে
অসংখ্য পাখির সাথে
দিনে রাতে
এই বাসাছাড়া পাখি ধায় আলো অন্ধকারে
কোন্ পার হতে কোন্ পারে।
ধ্বনিয়া উঠিছে শূন্য নিখিলের পাখার এ গানে—
“হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে।”

কবি প্রকৃতপক্ষে এই কবিতা তথা বলাকা কাব্যের প্রতিটি কবিতার মাধ্যমে জানাতে চেয়েছেন — থেমে থাকবার জন্য আমাদের হাতে কোন সময় নেই, তাকে গতি দিয়ে চঞ্চলতার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাওয়াই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য।

Scanned with CamSc